

শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাত্যা

মাওলানা গোলাম মোস্তফা
মুহাম্মদ শায়েস্তা খান আল আজহারী আল মাইজভাগুরী

শিবক, বিদআত

৩

কিছু অপব্যাখ্যা

মাওলানা গোলাম মোতফা মুহাম্মদ শায়েস্তা খান আল আজহারী আল মাইজিডাওয়ারী

প্রকাশনায়
তাজকিয়া

প্রকাশকাল
১৮ জানুয়ারী ২০১৩

মুদ্রণে

ইঙ্ক কর্পোরেশন
১০ নজির আহমেদ চৌধুরী রোড
আন্দারকিষ্টা, চট্টগ্রাম।

মূল্য
২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

ভূমিকা

আহলে সুল্লাত এবং আহলে তুরিকত দ্বারা চর্চিত অসংখ্য বরকতময় আমলকে এই সমাজ-সংস্কৃতি থেকে বিতাড়িত করার খুবই চতুর কিন্তু অসুস্থ পরিকল্পনা চলছে। ফুটপাথ থেকে নিয়ে তৃণমূল বইয়ের বাজারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া কিছু ছোট আকারের বইয়ের মধ্য দিয়ে চলছে এসব অপকীর্তি। এসব বইয়ের গড় ভাষ্য হল- 'ঈদে মীলাদুন নবী, ওরশ ফাতেহা, পীরের বায়াতে দীক্ষা নেয়া, তবারককাত গ্রন্থ, ইত্তিগাসা প্রভৃতি পুণ্য কাজ আসলে যেন এক একটি পাপ!!' এসবকে বিদআত ও শিরক নাম দিয়ে সাধারণ-শিক্ষিত সরল লোকদের ইসলামের উদার পথ থেকে সরিয়ে আনা এই বইগুলোর লেখকদের প্রাণাত্মক চেষ্টা।

'শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা' নামে আমাদের সংক্ষিপ্ত কলেবরের এ পুস্তকটি পাঠ করলেই বুঝে আসতে বাধ্য, কী দুর্বল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে সুল্লাত ও তুরিকতকে শিরক-বিদআত অপব্যাখ্যা দানকারী সেই লেখকদের বদ উদ্দেশ্য, অসৎ প্রচার!

বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করছি, এই পুস্তকে ফরজ ইবাদতসমূহ আমাদের ব্যাপারে আমরা কোন বিতর্কের অবকাশ পাইনি, ফরজ ইবাদতের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য অকটি-আগে ফরজ, তারপরেই আমাদের এই সুল্লাত ও তাসাউফ প্রতিষ্ঠার তাগাদাগুলো আমরা দিচ্ছি, ফরজকে বাদ দিয়ে তা প্রতিষ্ঠা করতে বলছি না।

শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা -৩

যশনপর্ব (১)

শিরক কি?

'আল মাওসুয়াত আল ইসলামিয়া আল আন্মা' ইসলামী বিশ্বকোষে শিরক বলতে অর্থ করা হয়েছে- আল্লাহর মালিকানা, গুণাবলিতে অথবা তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কিছুকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে অংশীদার করা।

আর এ কথাটি বুঝতে খুব একটা কঠিনও হওয়ার কথা নয় যে- কাউকে অত্মাহুদত্ত ক্ষমতার বাইরে আল্লাহরই মত ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে বলে উপাসনা করা বা বিশ্বাস করাটাই শিরক।

কোন কিছুকে অন্যায়সে শিরক বলার আগে মৌলিক দু'টি বিষয়ে মনোসংযোগ দরকার।-

(১) স্থান কাল পাত্র ভেদে শিরক এর বিধান আলাদা হতে পারে- এমনটি কোন সুপ্রাই বলা নেই। অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহর শিরক করাটা যেমন শিরক হতে পারত সৃষ্টির পরেও সেই একি বিষয়টিকেই শিরক বলা হবে, নতুন কিছুকে নয়। অন্য নবী রাসুলের যুগে যে ব্যাপারটি শিরক ছিল আমাদের নবীর যুগেও সেটাই শিরক। এটা শুধুমাত্র জায়েয নাজায়েযের মত এক যুগে বৈধ হয়ে অন্য যুগে অবৈধ হওয়ার মত বিষয় নয়। এটা আল্লাহর সাথে শিরক করার ব্যাপার- যা শিরক হলে সব স্থান কাল পাত্র ভেদেই শিরক।

(২) আল্লাহর যে সমস্ত ক্ষমতা বা গুণাবলি রয়েছে তার কিছু- কোন বান্দার মধ্যে থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করাটা শিরক নয়, সেটা তখনই শিরক হবে যখন আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতা মনে না করে অন্য কিছুকে সেই ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করা হবে।

যেমন- দয়া করা হল আল্লাহর গুণ। অথচ আমরা মানুষকেও দয়ালু বলে থাকি। কিন্তু সেটা শিরক হয় না। কেননা মানুষের দয়ালু হওয়ার মত এই গুণ আল্লাহরই প্রদত্ত।

অভিযোগ রটনা (১)

কোন আউলিয়া বুজুর্গ অলৌকিক বা অদৃশ্যভাবে কাউকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা কারো উপকার করতে পারেন বলে মনে করা একটি শিরকী আকীদা। বা

শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা -৪

কোন আউলিয়া বুজুর্গের কাছে সাহায্য চাওয়া বা তাঁরা কউকে সাহায্য করতে পারেন বলে বিশ্বাস করা শিরক-যেহেতু অদৃশ্যভাবে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাহায্য করতে পারে না !!

খণ্ডন

উপরের অভিযোগ মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস ব্যতীত আর কিছু নয়, বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

হাঁ, পবিত্র কুরআনে এমনটি বলা আছে বটে যে-আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই- [সূরা বাকারা, আয়াত ১০৭]। অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর কিছুকে সাহায্যস্থল মনে করা যাবে না।

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে-আল্লাহর কোন প্রতিনিধি বা পুণ্যবান বান্দার কাছে সাহায্য চাইলে তাতে আল্লাহকে বাদ দেয়া হবে। কেননা তাঁরা তো আল্লাহর পক্ষেই ন্যায়পরায়ণ। পবিত্র কুরআনে আরো পরিস্কার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে- হে মুসলমানগণ, তোমাদের সাহায্যকারী আল্লাহ, তাঁর রাসূল (দঃ) এবং ঐ সকল মুসলমান যারা নামায পড়ে, যাকাত দেয়- [সূরা মায়েদা, আয়াত ৫৫]।

এখান থেকে স্পষ্ট বুঝে আসে- স্বয়ং আল্লাহ না হয়েও অন্যকে সাহায্য করার ক্ষমতা আল্লাহর রাসূল (দঃ) এবং পুণ্যবান বান্দাদেরও রয়েছে- কেননা তা আল্লাহরই প্রদত্ত ক্ষমতা। যেখানে মহান আল্লাহ নিজের এই উপকারকারীদের কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন সেখানে তা বিশ্বাস করা শিরক হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

এই উপকার যে অলৌকিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও হতে পারে তারও সুস্পষ্ট বর্ণনা পবিত্র কুরআনে আছে। যেমন- সূরা মায়েদা ১১০ নম্বর আয়াতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে- মহান আল্লাহর আদেশে হজরত ঈসা (আঃ) মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরি করে তাতে ফুটতেন- আল্লাহর অনুমতিক্রমে তখন তা রাস্তার পাখি হয়ে যেত, আল্লাহর অনুমতিতে তিনি জ্ঞানাপ্ত ও কুষ্ঠরোগীকে ভাল করে দিতেন আর মৃতকে পর্যন্ত জীবিত করে তুলতেন।

আল্লাহর সঙ্গে নবীর এই যে যোগসূত্রের ক্ষমতা, জড়বস্তুতে প্রাণসঞ্চার এমনকি মৃতকে পর্যন্ত জীবিত করে তোলার ঘটনা আর জ্ঞানাকে ভাল করা- তা অলৌকিক নয় কি! খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা হলেও তা সাপিণ্ড হওয়ায় নবীর মাধ্যমে।

এখন আমরা দেখতে পাব- শুধুমাত্র নবী-রাসূলগণ নন, তাঁদের পরিষদ,

শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা -৫

তাঁদের প্রতিনিধি বা উত্তরসূরির জিম্মায় অর্থাৎ কোন আউলিয়া বুজুর্গের কাছেও সেই অলৌকিক ক্ষমতা থাকতে পারে, পবিত্র কুরআনে তারও বর্ণনা আছে। যেমন-সূরা নমল ৩৮ হতে ৪০ নম্বর আয়াতের ঘটনাটি- হজরত সুলায়মান (আঃ) তাঁর পরিষদবর্গের কাছে নির্দেশ দেন- সাবার লোকেরা আত্মসমর্পণ করে তাঁর কাছে আসার আগেই তাদের মধ্যে যে সক্ষম হবে সে যেন সাবার রানী বিলাকিনের সিংহাসনটি তাঁর কাছে এনে দেয়। আর তা শুন্যার পরপরই- শান্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এমন একজন পরিষদ চৌধুর পলকে মাত্র সেটি হজরত সুলায়মান (আঃ) এর সামনে উপস্থিত করেন।

এমন অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস ছিল বলেই হজরত আবু হুরায়রা (রঃ) একবার রাসূলে আকরম (দঃ) এর কাছে সেরকম একটি সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। বুঝারী শরীফ, কিতাবুল এলম, বাবু হেফজিল, এলম- এ ১১৯ নম্বর হাদীসে ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে- হজরত আবু হুরায়রা (রঃ) তাঁর হাদীস ভুলে যাওয়ার প্রবণতা হতে পরিভ্রাণের জন্য রাসূল (দঃ)-এর কাছে আর্জি করেন। তা শুনে রাসূলে আকরম (দঃ) তাঁর চাদরটি তাঁকে বিছাতে বসলেন। এরপর নবীজী বাতাসে একপ্রকার ইশারা করে নিজের হাত মোবারক সেই চাদরের রাখলেন আর হজরত আবু হুরায়রাকে সেটি ভাজ করে নিতে বললেন। তিনি তা করলেন। হজরত আবু হুরায়রা (রঃ) বলেন- নবীজী এভাবে বিষয়টি সমাধা করার পর তিনি আর কোনকিছু সেদিন থেকে ভুলে যাননি। এমন উদাহরণ প্রচুর রয়েছে হাদীসে।

তাছাড়া আল্লাহর উচ্চস্তরের বান্দার কাছে বিপদে সাহায্য চাইতে নবীজীও বলে দিয়েছেন। তিবরানী শরীফ ১৭তম খণ্ড ১১৭ নম্বর হাদীস (মুজামুল কবীর) এ বর্ণিত- নবী করীম (দঃ) ইরশাদ করেন- তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পথ হারিয়ে ফেলে অথবা সাহায্য চায় এমন জায়গায় যেখানে কেউ নেই- তখন সে যেন বলে- হে আল্লাহর বান্দা, আমাকে সাহায্য করুন। হাদীসের অন্যত্র এ কথার সাথে যোগ করা হয়েছে- কারণ আল্লাহর এমন কিছু বান্দা রয়েছে যাদের তোমরা দেখ না। শেষের কথাটি ধরা প্রমাণিত হয়- আল্লাহর সৃষ্টিকে সাহায্য করার এ বিষয়টি নিছক স্বাভাবিক সাহায্য নয়, কেননা 'যাদের তোমরা দেখ না' বলতে এখানে এটাই বুঝতে পারা যায় যে- বিপদগ্রস্থ বান্দাকে রক্ষা করতে সাহায্যকারী বান্দার বিভিন্ন স্থানে গায়েবী অস্তিত্ব আছে।

আর আল্লাহ প্রদত্ত যে ক্ষমতায় তাঁর রাসূল (দঃ) এবং আউলিয়া বুজুর্গ বা পুণ্যবান বান্দাগণ মানুষের উপকার করতে পারেন, সেই একই ক্ষমতাবলে

শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা -৬

তারা চাইলে অন্যায়ের শাস্তিও দিয়ে থাকতে পারেন। এটা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত। ফলে বিষয়টি নিয়ে শাস্ত্র অপটু যুর্গেরা যেমত অভিযোগ আনে- সেমত শিরক-বিদআত কোনটি তো তা নয়ই।

অভিযোগ রটনা (২)

মানের নিয়্যত বা কামনা বাসনা পূরণের জন্য আউলিয়া-বুজর্গের মাজারে জিয়ারত করতে যাওয়া শিরক, কেননা আউলিয়া-বুজর্গ বা নবী-রাসূল যে-ই হোন, মৃত্যুর পর কোন মানুষ কিছু করার ক্ষমতা রাখে না !!

খণ্ডন

আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতার জোরে কেউ সাহায্য করতে পারেন বলে বিশ্বাস করে- তার কাছে কামনা বাসনা পূরণের জন্য গেলে কোনক্রমেই শিরক হবে না- আমাদের প্রথম দুটি অধ্যায় থেকে এ সিদ্ধান্তটি স্পষ্ট হয়ে গেছে। আরো একটি বিষয় জানা আছে যে- যা এক ক্ষেত্রে আল্লাহর শরিক করা বুঝাচ্ছে না, অন্যত্রও তা শিরক হবে না। সুতরাং মৃত্যুর আগে-পরে যখনই হোক কোন পুণ্যাত্মার কাছে সাহায্য চাইলে তা অস্ত্র শিরক বলা তো সাজেই না। শিরক নয়, তবে প্রশ্ন জাগে- ইত্তেকালের পরে আসলেই কেউ সাহায্য করতে পারেন কিনা! সহীহ হাদীস থেকে এর একটি সুচল উত্তর আমরা পেয়ে যাব।

হুজুর পূরনুর (দঃ)-এর নবুওয়াতের আমলেই সংঘটিত হয়েছিল ঐতিহাসিক মেরাজ শরীফের ঘটনা। এ ঘটনা নিচয় আল্লাহর আরেক নবী হযরত মুসা (আঃ) এর ওফাতের বহু পরে ঘটেছিল। অথচ সেই পরের সময়েই- উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য মুসা নবী আবির্ভূত হয়েছিলেন এক অভিনব সাহায্য নিয়ে।- আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের নবী যখন উম্মতের জন্য দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার বিধান নিয়ে ফিরেছিলেন- ঊর্ধ্ব আসামানে তখন তাঁর সাথে মুসা নবীর সাক্ষাৎ হল। মুসা নবী- মুসলমানদের জন্য এত নামাজ পড়া খুব কঠিন হবে বলে মত দিলেন; আল্লাহর কাছে পুনরায় তা কমানোর সুপারিশ করতেও আমাদের নবীকে অনুরোধ করলেন তিনি। আর সত্যি সত্যি- উম্মতে মোহাম্মদীর কষ্ট লাঘবে মুসা নবীর এই কাতরতা কাজে লেগে গেল। দৈনিক মাত্র ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার এক সহজ বিধান- অবশেষে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের নবী অনুমোদন করিয়ে এনেছেন। বুখারী

শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা -৭

শরীফ, ৩৮৮৭ নম্বর হাদীস।

কবর জীবনের অস্তিত্ব প্রমাণে মুসা (আঃ) সম্পর্কিত আরো একটি হাদীস- হযরত আনাস বিন মালিক (রঃ) হতে বর্ণিত- রাসূলে পাক (দঃ) মেরাজের রাতে হযরত মুসা (আঃ)-কে তাঁর কবরের মধ্যে নামাযরত অবস্থায় অবলোকন করেছিলেন বলে এরশাদ করেন। মুসলিম শরীফ, বই ৩০, হাদীস ৫৮৫৮।

এখানে যে নিগূঢ় শিক্ষাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা এই যে- আল্লাহর প্রতিনিধিদের কখনোই মৃত বলা উচিত নয়। ইত্তেকালের সময়- মানুষের চোখের আড়ালে তাঁরা চলে যান মাত্র- কিন্তু তাঁদের সাহায্য থাকে আমাদের সাথেই।

নবী-রাসূল, আউলিয়া-বুজর্গের মাজারে আমাদের স্মরণাপণ্য হওয়ার একনিষ্ঠ লক্ষ্য হল- আমাদের ইহ-পারলৌকিক যে কোন সং বাসনা পূরণে আল্লাহর দরবারে তাঁরা যেন সুপারিশ করেন। আশেক-ভক্তের আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপারিশ করে সাহায্য করতে তাঁরা যে সত্যিকারের উপযুক্ত। কুরআনে পাকেই তো আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন- মকবুল বান্দাদের সাথে আল্লাহর নৈকট্যের সম্পর্ক তাঁদের ইত্তেকালের পরও একইরকম অবিচল থাকবে। সূরা ফুসিলাত, আয়াত ৩০-৩১।

যেহেতু আউলিয়া-বুজর্গের মাজার শরীফ স্মরণাপণ্য ব্যক্তির আর্জি তাঁরা শুনতে পান- এবং আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে তাঁরা সক্ষম- সুতরাং পরমবন্ধুর সুপারিশ আল্লাহর কাছে অধিকতর জোরালো হবে এতে সন্দেহ কী! যেমনটা তাঁরা দুনিয়াবী সময়ে সৃষ্টির উপকার করতেন- দুনিয়া থাকে পর্দা নেয়ার পরেও মানুষের মঙ্গল বিধানে তাদের ক্ষমতা অপরিবর্তিত, সেটা কুরআনে ঘোষিত আল্লাহর প্রতি অব্যাহত নৈকট্যের জোরেই।

এবার আমাদের বিবেচনার বিষয়- মানের নিয়্যত বা কামনা বাসনা পূরণের জন্য আউলিয়া-বুজর্গের মাজারে জিয়ারত করতে যাওয়া শিরক? না জরুরী?

অভিযোগ রটনা (৩)

হুজুর পূরনুর (দঃ)-কে সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহর নূরের অংশ অর্থাৎ জাতী নূর বলে ধারণা করা শিরক !! যুক্তি হল-সবার আগে হুজরত আদম (আঃ)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে- রাসূলও একজন আদম (আঃ)-এর বংশধর- সমস্ত আদম সংগ্রানের মতই তাই আমাদের রাসূল পাক-ও সৃষ্টির ব্যতিক্রম নন- তিনি মাটিয় তৈরি।

শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা -৮
খণ্ড

কুরআনে পাক সূরা কাহাফের ১১০ নম্বর আয়াতে রাসূলে কারীমের প্রতি আশ্রয় তাআলার ঘোষণা- বলুন- আমি তো তোমাদের মত মানুষ- আমার প্রতি ওই অবতীর্ণ হয়।- অসং উদ্দেশ্যে এই আয়াতকে ব্যবহার করে রাসূলে কারীমকে কারো সাথে তুলনা করা বা তাঁকে সাধারণ লোকের মত মাটির তৈরি বলে মনে করা বেশ কিছু কারণে ভুল ও বেয়াদবি।

প্রথমত- সেই আয়াতেই রাসূলের সাথে সাধারণ লোকের একটা পার্থক্য প্রমাণিত হয়- দৃশ্য মানুষের মত বটে- কিন্তু তাঁর উপর ওই নাজেল হয়- ফলে তিনি আর সাধারণ কেউ নন- মানুষের সাথে তাঁর মিল তো সেই বাহ্যিক সাদৃশ্যতেই সীমাবদ্ধ।

এভাবে ব্যাখ্যা করার অকাটা যুক্তি আছে- আয়াতটিতে ‘বাশারুন’ শব্দটি দ্বারা তাঁকে মানুষ বলা হয়েছে- সেটার অর্থ পরিপূর্ণ মানুষ সত্তা নয়- মানুষের উপরিভাগ বা চামড়াভাগ,- এক কথায় বাহ্যিক অবয়বকে ‘বাশারুন’ বলা হয়। আর সেই দেহ সত্তার সাথে ‘বাতিন’ বা আত্মা যুক্ত হলে তখন বলা হয় ‘আদমুন’ বা পরিপূর্ণ মানুষ। [সূত্র : মুফরাদাত আলফাযিল কুরআন]।

একবার হজরত জিব্রাইল আমীন পৃথিবীতে হজরত মরিয়ম (আঃ) এর নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন আল্লাহর নির্দেশে তাঁকে সন্তান দানের উদ্দেশ্যে- এ ঘটনা বলতে গিয়ে আল্লাহ পাক সূরা মরিয়মের ১৭ নম্বর আয়াতে জিব্রাইল আমীনকেও ‘বাশারুন’ শব্দে অভিহিত করেছেন বাহ্যিক মানুষের আকৃতিতে এসেছিলেন বলে- অথচ জিব্রাইল বাস্তবে মানুষ কখনোই নন।

এ থেকে স্পষ্ট- হুজুর পুরনুর-এর বাহ্যিক অবয়ব মানুষের মত বটে- কিন্তু বাস্তবে তাঁকে কারো সাথে তুলনা করার জো নেই। আল্লাহ তাঁকে সম্পূর্ণ আলাদা মতবা দিয়েছেন- হুজুর (দঃ) তো স্বয়ং তা উল্লেখ করেছেন- কে আছে তোমাদের মধ্যে আমার মত ? আমার পালনকর্তা পানাহার করান আমাকে- [বুখারী শরীফ ৮ম খণ্ড ২১৬ পৃষ্ঠা/ ৯ম খণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠা]।- এই পানাহার অদৃশ্য পানাহার- কেননা হাদীসে বিষয়টি সেভাবেই উঠে এসেছে- যে পানাহার সাধারণ মানুষের অধিগত নয়- আমাদের রাসূলের জন্য তা বিশেষ। এবং তাঁর ‘মত’ বা ‘তুলনীয়’ কেউ নেই- এটাও এখানে সাব্যস্ত হল।

সে ক্ষেত্রে সমস্ত আদম সন্তানের মত নবীজীকেও মাটির তৈরি বলা কখনো শাস্ত্রবিদের লক্ষণ কিনা জানা নেই। নবীজীর হাদীসে আছে- আমি সৃষ্টিগতভাবে সবার আগে- আর প্রেরিত হওয়ার দিক দিয়ে সবার পরে

শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা -৯

[খাসায়েরুল কুরআ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩]। আরো বলেছেন তিনি- আমি তখনও নবী ছিলাম- আদম (আঃ) যখন রুহ ও শরীরের মধ্যবর্তী ছিলেন- [হাকেম আল মুস্তাদরক, ২য় খণ্ড ৬০৯ পৃষ্ঠা]।

আদম (আঃ) এর অস্তিত্বেরও পূর্বে যিনি নবী- সমস্ত সৃষ্টির আগে এমনকি যার সৃষ্টি- তাঁকে অন্য সব মানুষের মত আদম সন্তান বলে তুলনা দিয়ে- মাটির তৈরি প্রমাণ করার চিন্তাভাবনাগুলো- এক ঐতিহ্যময় বেয়াদবীর উপর প্রতিষ্ঠিত। মাটির তৈরি তো ননই- কুরআনে আল্লাহ পাক রাসূলে আকরম (দঃ)-কে বরং নূর বলে ঘোষণা দিয়েছেন [সূরা মায়েদা, আয়াত ১৫]। আল্লাহর এই ঘোষণাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ নেই- যেহেতু অসংখ্য হাদীস প্রমাণ বহন করে রাসূলে পাকের জাতী নূর হওয়ার।

আল বিদায়া ওয়াল নিহায়া গ্রন্থের ২য় খণ্ড ১৬৪ পৃষ্ঠা, আবু বকর বায়হাকীর বর্ণনা মতে, হযরত উসমান বিন আবিলা আঁসের মা দেখতে পেয়েছেন- মা আয়েনার কোলে রাসূলে পাকের জনের সময় সারা ঘর আলোকিত হয়ে যায় এবং আকাশের তারাগুলো জমিনের খুব কাছে এসে পড়ে, এ ব্যাখ্যা তীত।

জাতী নূরের এসব শক্ত দৃষ্টান্তগুলো ঈমানে ধরতে না পারলে, তাতে কেবল শিরক খুঁজে পেল- যে কারো জন্য ভারী আফসোস থেকে যায়।

অভিযোগ রটনা (৪)

রাসূলে পাক (দঃ) এলমে গায়ের অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানেন বলে মনে করা জঘন্য শিরক, কারণ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অদৃশ্য বিষয় জানেন না, রাসূল শুধুমাত্র ওহীর মাধ্যমেই যা কিছু জানতেন- তাঁর নিজের এলমে গায়ের বলে কোন ক্ষমতা ছিল না !!

খণ্ড

‘ইলমুল গায়ের’ বলতে সেন্সর কিছুর জ্ঞান বুঝায় যা প্রকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার স্পর্শ দ্বারা দেখা, শোনা, ছোঁয়া, ঘ্রান নেয়া বা অনুভব করা যায় না- সাধারণভাবে মানুষের যা জানার ক্ষমতা তীত।

ঐশীগ্রন্থ কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন- তিনি (আল্লাহ) অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত, তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান তিনি কারো নিকট প্রকাশ করেন না, মনোনিীত রাসূলকে জানিয়ে থাকেন- [সূরা জ্বীন, আয়াত ২৬-২৭]। প্রমাণিত হয়- হুজুর (দঃ) এর উপর এলমে গায়েরের ক্ষমতা আল্লাহ অর্পণ করেছেন। শুধু কুরআনের বাণী দ্বারাই আমাদের রাসূল সবকিছু জেনেছেন

শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা-১০

এমন নয়- এলমে গায়েবের অলৌকিক ক্ষমতায় তিনি একবার উহুদ পাহাড়ে আরোহণের সময় হযরত ওমর ও হযরত উসমান (রঃ) এর শাহাদাত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন [বুখারী শরীফ মে খঃ, ৫৭ নম্বর বই, ২৪ নম্বর হাদীস]। এটা কুরআনের ওহীর এলমে গায়েব নয়, বরং রাসুলের জিম্মায় আল্লাহপ্রদত্ত অনন্য এক অন্তর্দৃষ্টি। এমন আরো প্রচুর উদাহরণ রয়েছে তাঁর এলমে গায়েবের প্রামাণ্য।

সূরা জ্বিলের আয়াতে রাসূলকে এলমে গায়েবের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে বলে ঘোষিত হয়েছে- অন্যত্র সূরা কাহাফে আল্লাহ পাক খিজির (আঃ) এর যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন- তাতে এটাও অবগত হয়েছি- যে- রাসূল আলমীন চাইলে শুধু তাঁর রাসূলকে নয়, যে কোন মনোনীত সত্তাকে এই এলমে গায়েবের ক্ষমতা দিতে পারেন। তাতে বলা হয়েছে- অতঃপর তারা আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের সাক্ষাৎ পেল, যাকে আমি আমার কাছ থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম- আর শিক্ষা দিয়েছিলাম বিশেষ জ্ঞান- [সূরা কাহাফ, আয়াত ৬৫]। এবং এ সূরার ৭১ থেকে ৮২ নম্বর পর্যন্ত আয়াতে হযরত: মুসা (আঃ) ও খিজির (আঃ) এর মধ্যকার দীর্ঘ ঘটনাটিতে- খিজির (আঃ) এর বেশ কিছু অযৌক্তিক কর্মকাণ্ডে হযরত মুসা (আঃ) প্রতিক্রিয়া দেখালে- অবশেষে খিজির (আঃ) সংবাদ দেন- সবগুলো ঘটনা এভাবে না ঘটালে ভবিষ্যতে কী অনিষ্ট হত- যে সংবাদ জানা অদৃশ্য জ্ঞান বা এলমে গায়েব ছাড়া অসম্ভব ছিল।

অভিযোগ রটনা (৫)

রাসূলে পাক (দঃ) কে হাযের নাযের- অর্থাৎ অদৃশ্যভাবে যে কোন স্থানে যে কোন কিছু তিনি দেখতে ও শুনতে পান- বলে বিশ্বাস করা শিরক! এবং তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম যেখানেই পাঠ করা হয়, সেখানে তিনি বিরাজ করেন বলে বিশ্বাস করাও দুর্দান্ত শিরকী আক্বীদা !!

খণ্ডন

আল্লাহ রাসূল আলমীনের অত্যন্ত স্পষ্ট ঘোষণা- হে নবী আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যপ্রদানকারী রূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে- [সূরা আহযাব, আয়াত ৪৫]। এখানে রাসূলুল্লাহ (দঃ)-কে সমস্ত বিশ্ববাসীর সমস্ত কর্মকাণ্ডের উপর সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যে কোন স্থানে যে কোন কিছু তিনি দেখতে ও শুনতে না পেলে এই সাক্ষ্য তিনি আল্লাহর

শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা-১১

কাছে দেবেন কিভাবে! হুজুর পুরনুরের হাযের নাযের হওয়ার- এর চেয়ে বড় দলিল আর হতে পারে না।

এ ক্ষেত্রেও দেখতে পাই- আল্লাহ চাইলে প্রেরিত রাসূল ছাড়াও তাঁর অন্য যে কোন মকবুল বান্দাকে এই হাযের নাযেরের বৈশিষ্ট্য দান করে ধন্য করতে পারেন। আস দিলসিলাতুন সাহিহিয়া লিল আলবানী গ্রন্থের ১১১০ নং হাদীসে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) প্রশংসে ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে- একবার জুমার নামাজে খুতবার মিম্বরে থাকা অবস্থায় আমিঞ্চল মুমিনীন হঠাৎ চিংকার দিয়ে উঠে বলেন- ইয়া সারীয়া! জাবাল অর্থাৎ হে সারীয়া, সামনে পাহাড়। অথচ মুসলিম সেনাপতি হযরত সারীয়া তখন ছিলেন দূরবর্তী নাহাওয়ানদের যুদ্ধে। মুসল্লীরা এতে অবাক হন।- পরে যুদ্ধ শেষে বিজয় লাভ করে হযরত সারীয়া চিঠি পাঠালেন যে- যুদ্ধের এক পর্যায়ে খলিফা ওমর ইবনে খাত্তাবের আওয়াজে ইয়া সারীয়া! জাবাল কথাটি হঠাৎ তাঁর কানে এল- সেই মাত্র তিনি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখতে পেলেন পাহাড়ের প্রান্তে শত্রুরা অতর্কিত আক্রমণের জন্য ঘিরে রয়েছে- কিন্তু খলিফার সেই অলৌকিক সতর্কবাণীর কারণে অবশেষে মুসলিমরা বিজয়ী হয়। (এছাড়া তারিখে দামেক, বায়হাকী শরীফ, কাশফুল খাফা লিল আজলুমী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থেও ঘটনাটির বিবরণ আছে।)

অদ্ভুত ও চমৎকার এই দৃষ্টান্ত। অজহু দূরত্বে নাহাওয়ানদের যুদ্ধের সেনাপতির কাছে পৌঁছে গেল খলিফার কণ্ঠ। এ তো একাধারে হাযের নাযের, এলমে গায়েব, কারামত, ইন্তেগাসা (সাহায্য) সবকিছুকই সঠিক বলে বিশ্বাস করাকে কর্তব্য বলে সাব্যস্ত করে। ফলে এসবকে শিরক বলার অবকাশ তো সমূলে রহিত হয়।

অভিযোগ রটনা (৬)

কোন পীর বৃজপের পরিভাষ্য কোন বস্তুতে বরকত আছে বলে মনে করা এক প্রকার শিরক !!!

খণ্ডন

সম্ভবত শিরক এর সবচেয়ে হাস্যকর অভিযোগ এটি। কারণ আল্লাহর শরীক করার সাথে পরিভাষ্য বস্তুর কী সম্পর্ক- কঠিন রহস্যই থেকে গেল! আল্লাহর মকবুল বান্দার পরিভাষ্য বস্তু তো ঈমানের সহায়ক ও মনের সম্ভ্রান্তি বিধায়ক। আল্লাহ বলেন- বনী-ইসরাঈলকে তাদের নবী আরো বলে

শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা -১২

দিয়েছেন, তালুতের নেতৃত্বের চিহ্ন হল এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিঁদুক আসবে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সম্ভাব্য নিমিত্তে। আর তাতে থাকবে মূসা, হারুন এবং তাঁদের সম্ভাব্যপূর্ণের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী। সিঁদুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। [সূরা বাকারা, আয়াত ২৪৮]।

এছাড়া হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জামা তাঁর পিতার জন্য তারাককাত হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল, এই বরকতময় জামাটি চোখে লাগালে অন্ধ পিতার চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছিল- [সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯৩ ও ৯৬]।

আরো অভিনব ও নিরঙ্কুশ সম্পদ উদাহরণটি দেখুন- হযরত আনাস (রঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর (দঃ) মিনায় অবস্থিত তাঁর তারুতে পদার্পণ করলেন। তখন তিনি নাপিতকে ডেকে তাঁর মাথার ডান দিকে মুড়িয়ে দিতে বললেন, নাপিত তা মুড়িয়ে দিলো। এরপর নবী করিম (দঃ) হযরত আবু তালহা আনসারীকে ডাকলেন- তাঁকে দান করে দিলেন উক্ত চুলগুলো। হুজুর পুরনুর আবার নাপিতকে তাঁর মাথার বাম পাশটি মুড়িয়ে দিতে বললেন, মুড়িয়ে দিলে- উক্ত চুলগুলো তিনি হযরত আবু তালহা (রাঃ)-কে দিয়ে বললেন- এগুলো মানুষের মধ্যে বন্টন করে দাও।- [মুসলিম শরীফ, বই ৭, হাদীস ২৯৯৪]। এই মুড়ানো চুল মোবারককে পরিত্যক্ত বস্তু বলেই নিশ্চয় স্বীকার করা হবে, অতি অবশ্য- বস্তুটি যার পরিত্যক্ত- তাঁর অবস্থান ও মর্যাদা নিয়ে কোন সংশয় না থাকলে সেই পরিত্যক্ত বস্তুরও বরকত অবিসংবাদী হবে।

অভিযোগ রটনা (৭)

কোন আউলিয়া বুজুর্গের প্রতিকৃতি বা ছবিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রানবন্ত মনে করা অথবা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তা টাঙ্গিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত আছে বলে বিশ্বাস করা একটি শিরকী ধ্যান ধারণা।

ধ্বংস

যে কোন ধরনের ছবি- সোটা ফটোও হতে পারে- চলমান ভিডিও ক্লিপও হতে পারে- পেইন্ট বা ভাস্কর্যও হতে পারে- কিন্তু যেটাই হোক- কোন না কোনভাবে এগুলোর সবই যে ছবি বা প্রতিকৃতি- একথা ভুলে গেলে চলবে

শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা -১৩

না। সুতরাং- এ ব্যাপারগুলো বৈধ কিনা- এমন প্রশ্ন এলে তার উত্তর হবে- সব ধরনের প্রতিকৃতির ব্যপারে ইসলামে সিদ্ধান্ত একটাই- সোটি জায়েয বা নাজায়েয যেমনই হোক।

আজকের প্রজন্ম- ছবিকে 'বৈধ নয়' বলবার সাহস কার আছে ? কথায় কথায় শিরক বিদআত খুঁজে পাওয়া সেই ধর্মবেত্তাদেরও (!) নেই। যেহেতু দরকার পড়লে ছবি তাদেরও না তুলে উপায় থাকছে না। হজুর সময় ফটো অবশ্যই তুলতে হচ্ছে- পাসপোর্ট ছবি দেয়া অনিবার্য বলে। পত্রপত্রিকা- টেলিভিশনে হরহামেশা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রচার চলছে ছবি বা ভিডিওর মাধ্যমে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে এসব নাজায়েজবাদীরাও সান্ত্বনে ছবি তুলছে, ভিডিওতেও থাকছে। অর্থাৎ আজকাল এ বিষয়টিকে হারাম বলতে গিয়ে কেউ নিজের পায়ে কুড়াল মারে না।

প্রতিকৃতি তৈরি করা আসলে কোনো অপবিত্র কাজ নয়- তার দৃষ্টান্ত তো গ্রন্থিহীন কুরআনে আছে।- হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে বেশ কিছু নেয়ামত অল্লাহ পাক দিয়েছিলেন- এর মধ্যে কতিপয় জ্বীনও ছিল- যারা অল্লাহর অনুমতিক্রমে হযরত সুলায়মান (আঃ) এর জন্য কাজ করত। সুলায়মান (আঃ) এর ইচ্ছানুযায়ী তারা শাসাদ, প্রতিকৃতি, বৃহদাকার খালা ইত্যাদি নানা জিনিস নির্মাণ করত। [সূরা সা-বা, আয়াত ১২-১৩]।

সুস্থ ধরার প্রতিকৃতির ব্যাপারে নবীজীরও অনুমোদন ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কাছে একটি পাখাওয়ালা ঘোড়ার প্রতিকৃতি দেখে নবীজী গুধু হেসেছিলেন, তা নিয়ে খেলতে নিষেধ করেননি- [সুনাানে আবু দাউদ, বই নম্বর ৪১, হাদীস নম্বর ৪৯১৪]। এ থেকে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে- ছবি বা প্রতিকৃতির বিরুদ্ধে নবীজীর যেসব হাদীস দেখানো হয় বস্তুত তা নিষেধ হয়েছিল- ছবি নাজায়েয বলে নয়- বরং এ ক্ষেত্রে ছবি রাখার উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন অকল্যাণ নিহিত ছিল বলে। যদি আদতেই তা নিষিদ্ধ হত তাহলে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কেও তিনি নিষেধ করতেন। সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা যেটা দাঁড়ায়- হযরত আয়েশার জন্যে ঘোড়ার আকৃতি নিয়ে খেলা নিষেধ হয়নি- কিন্তু সেই ঘোড়ার প্রতিকৃতিতে নিয়ে মূর্তি পূজা করলে- একই জিনিস তখন শিরকের পর্যায়ে যেত। গুলগোলটা উদ্দেশ্যেই নিহিত থাকে ছবিতে নয়। সং উদ্দেশ্যে ছবি রাখা হলে এবং তা অশ্লীল কিছু না হলে অবশ্যই হবে বৈধ।

আউলিয়া বুজুর্গের ছবি টাঙ্গিয়ে রাখলে-শিরক এর অভিযোগ আসছে। উত্তরে প্রথমেই বলবার আছে- ভালমতে জেনে আসুন- এখানে অল্লাহর অংশীদার

শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা - ১৪

করার মত কিছুই ঘটছে না- তারপর এই ছবি টাঙানো নিয়ে ভক্ত-অনুরক্তদের আসল উদ্দেশ্যটি কী- তেবে দেখুন। প্রাত্যহিক যখন অনুসারীদের চোখ-সেই টাঙানো ছবির দিকে নিবিষ্ট হয়- তাদের মনে বারবার পীরের বরযা-স্মরণ হতে থাকে, পীরের আদেশ-নিষেধগুলো মনে পড়ে, খোদাভীরবতার ব্যাপারে তারা সচেতন হয়। ঐ ছবি তখন খোদাভীরবতার নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়- যা আল্লাহর নিদর্শন সেটাকে সম্মান করতে তো পবিত্র কুরআনে বলা আছে। [সূরা হুজ্জ, আয়াত ৩২]।

আবার একটি সাবধানতারও খুব দরকার- পুণ্যাত্মা আউলিয়ায়ে কেব্রামের ছবি যততদ্র টাঙ্গিয়ে রেখে আমরা যেন পবিত্র বিষয়কে সম্মানের নামে উদ্ভৈত অমর্যাদা না করে বসি।

অভিযোগ রটনা (৮)

দরদ পড়ার সময় মওলানা মুহাম্মদ (দঃ) বলা অথবা কোন আলেম উলামাকেও ‘মওলানা’ বলে সম্বোধন করা শিরক। কেননা ‘মওলানা’ (মওলানার মূল শব্দ), ‘রব’ এসব একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট !!

খণ্ডন

‘মওলানা’ বা ‘রব’ যার অর্থ প্রভু- এ শব্দগুলো শুধু আল্লাহকে ডাকার জন্য নির্দিষ্ট বিশেষণ নয়- স্বেচ্ছাবিশেষে আল্লাহর বান্দাকেও এ বিশেষণে ডাকা যায় তা কুরআনে আল্লাহ নিজেই দেখিয়েছেন- ঐ ত্বীলোক ইউসূফ হতে অসৎকর্ম কামনা করল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল, এবং বলল- এশো। ইউসূফ বললেন- আমি আল্লাহর স্মরণ নিচ্ছি- তোমার স্বামী হলেন আমার রব (প্রভু), তিনি আমাকে সম্মানের সাথে থাকতে দিয়েছেন, নিশ্চয় সীমা লঙ্ঘনকারীরা সফল হয় না। (অর্থাৎ ইউসূফ আঃ পা দেননি প্রেরোচনায়)- [সূরা ইউসূফ, আয়াত ২৩]। এখানে ইউসূফ (আঃ) রব বলেছেন তাঁর গৃহস্থামীকে, আর বিষয়টি ঐশীগ্রহে তুলে ধরেছেন স্বয়ং রাবুল আলামীন- তাতে প্রতীয়মান হচ্ছে- গৃহস্থামীকে রব ডাকলেও সেই ডাকে আল্লাহর নবীর পক্ষে কোন রকম শিরক হয়ে যায়নি।

আরো সহজেই কিছু বিষয়টি বুঝে আসবার কথা।- যেমন ‘মাস্টার’ শব্দের অর্থও প্রভু। কিন্তু সে কারণে কোন শিক্ষক বা বিশেষজ্ঞকে যখন মাস্টার নামে ডাকা হয় তাতে তো কেউ শিরকের অভিযোগ তোলে না। স্বেচ্ছাবিশেষে

শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা - ১৫

সাধারণ লোককেও যেখানে প্রভু সম্বোধন করাটা অবাস্তব কিছু নয়- সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হুজুর পূরনুর (দঃ)-কে মওলানা বলে মর্যাদা দেয়ার মধ্যে ভুল বৈ মন্দ কী আছে।

অভিযোগ রটনা (৯)

কবরে বা মাজারে কিংবা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে সোজদা করা সুস্পষ্ট শিরক।

খণ্ডন

“কাউকে আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষমতার বাইরে আল্লাহরই মত ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে বলে উপাসনা করা বা বিশ্বাস করাটাই শিরক”- শিরকের সংজ্ঞায় শুরুরেই এ বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছিলো আমরা।

সুতরাং আল্লাহর মকবুল বান্দাকে সোজদা করা সম্মানের উদ্দেশ্যে হলে সেটি কিছুতেই শিরক হিসেবে গণ্য হবে না- কেননা তা উপাসনার নিমিত্তে করা হয় না- কাজেই তাতে আল্লাহর সাথে শরিক করারও কোন কিছু ঘটে না। তবে হ্যাঁ, ইবাদতের নিমিত্তে অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভু মনে করে যদি সোজদা দেয়া হয় তবে অতি অবশ্য তা আল্লাহর সাথে শরিক করার অপরাধে শিরক হবে, যেহেতু ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই খান বা নির্দিষ্ট।

সম্মান প্রদর্শন এবং ইবাদত যেটাই হোক- নিয়্যতেভের উপর নির্ভর না করে কেবল সোজদা দেয়ার মাধ্যমেই যদি শিরকের হুকুম বর্তীত তবে মহান রাবুল আলামীনের ঘোষণাই মিথ্যে হয়ে যেত !! কেননা কুরআনে পাকে আল্লাহ স্বয়ং বিবৃত করেছেন আদম (আঃ)-কে সোজদা দেয়ার জন্য তিনি ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছেন [সূরা বাকারা, আয়াত ৩৪]। এ থেকে দিবাগোচকের মত স্পষ্ট প্রমাণিত হয়- আদম (আঃ)-কে দেয়া ফেরেশতাদের এ সোজদা ইবাদতের সোজদা ছিল না, সম্মান প্রদর্শনের সোজদা ছিল, এবং সম্মান প্রদর্শনের সোজদা শিরক নয় বলেই যাবতীয় বিধানের হর্ত্বকর্তা রাবুল আলামীন ফেরেশতাদের তা আদমের উদ্দেশ্যে করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঘটনাটি ভিন্ন খাতে নেবার কোন সুযোগ নেই, কারণ যে শিরককে আল্লাহ প্রবলভাবে অপছন্দ করেন, ফেরেশতা বালুন আর মানুষই বালুন কোন বান্দাকেই তিনি সেই শিরকের নির্দেশ দেয়ার প্রস্তুতি কখনোই আশে না। কাজেই মহান আল্লাহর এ ঘোষণা দ্বারা- পুণ্যাত্মকে সম্মান প্রদর্শনের সোজদা বিষয়টি আর যা-ই হোক- আল্লাহর সাথে শরিক করা যে

শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা -১৬

অন্তত নয়- তা নিরঙ্কুশভাবে প্রমাণিত হয়।

এ বিষয়টি নিয়ে শিরকের অভিযোগসমূহ আরো হাস্যকর মনে হবে- যখন দেখা যায়- হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে তাঁর পিতা ও পরিজনেরা সেজদা দিয়েছিলেন- এমন ইতিহাসও বিবৃত হয়েছে কুরআনে পাক [সূরা ইউসুফ, আয়াত ১০০]। হযরত ইউসুফকে দেয়া এ সেজদা যদি শিরক হত তবে তা তিনি কেনইবা গ্রহণ করতে যাবেন, তাঁর পিতা পরিজনেরাই বা তা কেন দিতে যাবেন, আর মহান আল্লাহই বা কেন উম্মেদে মোহাম্মাদীর জন্য তা উদাহরণ হিসেবে পবিত্র কুরআনে তুলে ধরবেন। এমন দৃষ্টান্তকে শিরক অভিযোগ তোলায় গণ্ডমূর্খেরা আবার বেজায় সাহসে ধর্মীয় আলোমের লেবাসও পরিধান করে !!

এ পর্যায়ে রাসুলের হাদীস থেকে প্রমাণ মিলবে, আল্লাহর পরম প্রিয় বন্ধুর উদ্দেশ্যে সেজদা দেয়া- আল্লাহর সাথে শরিক করার কোন বিষয় নয়, এই তাহিয়া বা তাযিমী সেজদা (সম্মান প্রদর্শনের সেজদা) দ্বারা ঈমান নষ্ট হয় না, এটা শিরক এর কোন আলামতই নয়। তফসীলের কবির প্রথম খণ্ড ৪২৭ পৃষ্ঠায় হযরত সুহাইব (রঃ) এর বর্ণনা সূত্রে বিবৃত আছে- হযরত মায়াজ (রঃ) ইয়ামান দেশ হতে ফিরে এসে রাসুলে করীম (সঃ)-কে সেজদা করলেন, এবং বললেন- ইয়ামানে তিনি ইহুদী ও খ্রিস্টানদের দেখে এসেছেন- তারা তাদের আলোম, ধর্মগুরু এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের সেজদা করে, তাড়াই বলেছে- কাজটা নবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্বরূপ। এ শুনে রাসুলে পাক (সঃ) বললেন- ইহুদী-নাসারাগণ তো নিজেদের নবীর উপর অপবাদ দিয়েছিল।- এখানে রাসুলে আকরম (সঃ) ইহুদীদের কার্যক্রমের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন বটে, কিন্তু মায়াজ (রঃ)-এর এ সেজদাকে তিনি তিরস্কারও করেননি, এবং এটাও বলেননি যে এই সেজদা করার ফলে হযরত মায়াজের শিরক হয়ে গিয়েছে। নতুনভাবে ঈমান আনার মত তেমন কিছুই এতে ঘটেনি। তা যদি ঘটত নবীজী মায়াজকে শিরক হেতু পুনরায় ঈমান আনতে বলতেন।

মিশকাত শরীফের ওয় পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ অর্থাৎ যে হাদীসগুলো জয়ীফ হাদীস তথা দুর্বল ভিত্তির হাদীস- এমন কতিপয় হাদীস দ্বারা সেজদাকে নাজায়েজ প্রমাণের কিছু প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এ হাদীসগুলোকে সত্য মানলেও তাতে সেজদার নিষেধ না যতটুকু বুঝায় তার চাইতে বেশি ইঙ্গিত বহন করে এ যে- ইসলামের প্রাথমিক যুগে সবেমাত্র পৌত্তলিকতা বর্জন করে ইসলাম গ্রহণ করা নও মুসলিমদের হেফাজত করা। কারণ

শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা -১৭

ধর্মদীক্ষায় কাঁচা অবস্থায় মুসলমানরা যদি তখন নবীকে সেজদা করার অধিকার লাভ করত, তবে এমন একটা ভয় ছিল যে কিছুদিন আগেই ছেড়ে আসা মূর্তিপূজার অভ্যাসবশত তারা নবীজীকেও সেজদা আকারে সম্মানের চেষ্টে বেশি উপাসনা করে বসবে। কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ইবাদত-উপাসনা করা শিরক। মুসলমানদের এই বিপদ থেকে হেফাজতের উদ্দেশ্যেই নবীজী তৎকালে সেজদার ব্যাপারে উৎসাহিত করেননি। কিন্তু এই শিরকের ভয় যখন ছিল না- তখন নবীজীকে বিষয়টি নিয়ে আর কঠোরতাও করতে দেখা যায়নি- পূর্বাভাস মায়াজ (রঃ) সম্পর্কিত হাদীসে সেটি পরিলক্ষিত হয়। কাজেই তাযিমী সেজদা বা সম্মান প্রদর্শন, আল্লাহর পরম বন্ধুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হলে এবং তা ইবাদতের কাছাকাছি গিয়ে না পৌঁছালে- সেখানে শিরক হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই বরং তা আল্লাহর প্রতিনিধির কাছে অনুসারী হওয়ার চরম নিদর্শন। নবী-আউলিয়ার মাজারে হোক বা তাঁদের জীবদশায় হোক উভয় ক্ষেত্রে এ সেজদা দেয়ার অর্থ হল- এক অনন্য সম্মান প্রদর্শন করা মাত্র।

খণ্ডনপর্ব (২)

বিদআত কি ?

‘আল মাওসুয়াত আল ইসলামিয়া আল আন্মা’ ইসলামী বিশ্বকোষে বিদআত এর যে অর্থ দেখানো হয়েছে তা হল- পূর্বে দৃষ্টান্ত নেই- এমন নতুন নতুন উদ্ভাবন, নবীজীর পরে যা উদ্ভাবিত হয়েছে ভাল হোক- মন্দ হোক সবগুলোই বিদআত।

ইসলামে ধর্ম বিদআতের বিধান কী- তা জানতে হলে সবার প্রথমেই দুটো বিভ্রান্তিকে মূলোৎপাটিত করতে হবে-

(১) যে কাজকে বিদআত বলে প্রচার করা হচ্ছে আদৌ সেটি বিদআত কিনা- মানে দ্বীন ইসলামে বা মুসলমানদের আমলে সংযোজিত নতুন কোন বিষয় কিনা তা তলিয়ে দেখতে হবে। এর কারণ হল- নবীজীর সময়েই কখনো ঘোষিত বা অনুমোদিত হওয়ার পরও সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য অনেক বিষয়কে বিদআত বলে রটিয়ে বেড়ানো হয়- অথচ যা বিদআত নয়।

(২) বিদআত- অর্থাৎ নতুন সংযোজন হলেই যে সেটি ইসলাম প্রত্যয়েক নিষিদ্ধ হয়ে যাবে- তা নয়। নতুন নতুন সংকাজের উদ্ভাবন বা নতুন ভাল কৌশল অবলম্বন করা হলে সেটা বিদআতে হাসানা (পুণ্যময় বিদআত বা অনুমোদিত বিদআত) বলে পরিগণিত হবে।

অভিযোগ রটনা (১)

বিদআতকে বিদআতে হাসানা ও বিদআতে সাইয়া এরকম দুইভাগে ভাগ করার বিষয়টিও বিদআতের মধ্যে পরে। প্রত্যেক বিদআত বা নতুন সংযোজন নাকি হারাম, সে ক্ষেত্রে এই দুই ভাগে ভাগ করাও এক নতুন সংযোজন বা বিদআত !!

খণ্ডন

এই অভিযোগের কৌতুকময় দিকটি বুঝতে হলে কিতাবের দলিলেরও প্রয়োজন পড়ে কি ? নূনতম প্রাপ্তবয়স্কতা আর বুদ্ধির দরকার মাত্র। ‘ভাল খারাপ বুঝি না- সব বিদআতই হারাম’- বলে হয়ত যারা কোন আজগুবি শাস্তি পেয়ে থাকে- আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কোন কিছুই তারা সম্ভবত গ্রহণ

করে না- নাকি !? ধরুন রাসুলের যুগে ছাপার মেশিন ছিল না, সুতরাং এই মেশিন ব্যবহার করা- কথিত ধর্মবৈভাদের (?) মতে বিদআত হবার কথা। অথচ সেই নতুন উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে শিরক বিদআত নামের বই ছাপালে বোধ করি ওদের বিদআত হয় না !!

এবার দেখুন- এ ব্যাপারে নবীজীর প্রকৃত উপদেশ কী ছিল। নতুন প্রচলন বা উদ্ভাবনকে বিদআতে হাসানা ও সাইয়া এ দুই ভাগে ভাগ করাও রাসুলে পাকের হাদীস থেকেই শেখা। মসনদে ইমাম আহমদ ৪র্থ খণ্ড ৩৫৭ ও ৩৫৯ নম্বর হাদীসে- বলেছেন নবীজী- যে কেউ ইসলামে কোন হাসানা (ভাল রীতি) প্রচলন করল সে এর জন্য সওয়ার পাবে, যারা এর উপর আমল করবে তারাও সওয়ার পাবে, কমতি হবে না এদের কারো সওয়াবে। আর কেউ যদি ইসলামে কোন সাইয়ার (মন্দ রীতি) প্রচলন ঘটায়- এর জন্যও তার পাপ হবে, এর উপর আমল করবে যারা- পাপ তাদেরও হবে এবং কারো পাপের মধ্যে কমতি হবে না (মুসলিম শরীফেও হাদীসটির উল্লেখ রয়েছে)। নব প্রচলন বা বিদআতের দুটি প্রকার যে রয়েছে এ তথ্য আমরা হাদীস শরীফ থেকে পেয়েছি। অথচ সেই দুই প্রকার বলাকেও হারাম বলে রটনা শুরু হয়েছে। তবে এই হারাম কাজ করলে কে ? আমাদের নবী ?! (আল্লাহর পন্থা)।

‘প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা’ বলে অবশ্য যে একটি হাদীস রয়েছে- সেখানে বিদআত বলতে ভাল কাজের বা সংকর্মের বিদআত উদ্দেশ্য নয়। কেননা সংকর্ম মাত্রই কখনো ভ্রষ্টতা হতে পারে না। আর নবীর কথা কখনো ষবিরাধী নয় বলে এ হাদীসে ‘প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা’ বলতে- প্রত্যেক মন্দ বিদআতের কথা নির্দেশ করা হয়েছে বলে- বুঝে নিতে হবে। যে নতুন আমল বা কৌশল মানুষের কোন ক্ষতি করে না, আল্লাহ-রাসুলের দ্বিনেরও কোন ক্ষতি করে না, বরঞ্চ সঠিক প্রয়োগ করলে দ্বীন দুনিয়ার উপকার হয়- ন্যায় বিচারের ধর্ম ইসলামে তা খামখা নিষিদ্ধ হতে পারে কোন দৃষ্টে !

অভিযোগ রটনা (২)

রাসুল (দঃ) এর জন্ম ও মহাপ্রয়াণ দিবসকে কেন্দ্র করে রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মিলাদুন্নবী মাহিফিল করা সম্পূর্ণ বিদআত !!।

খণ্ডন

সূরা ইউনুসের ৫৭ ও ৫৮ নম্বর আয়াতে রাসুল আলামীন বলেছেন- হে মানব

সমগ্রদায়, তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে তোমাদের প্রতি এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যে ব্যাধি আছে তার প্রতিকার- আর এসেছে বিশ্বাসীদের জন্যে পথনির্দেশ এবং দয়া। বলুন- এ তো আল্লাহর অনুগ্রহ- ও তাঁর রহমত, সুতরাং এটি নিয়ে তাঁরা আনন্দ করুক।- দেখুন- আল্লাহ এখানে নির্দেশনা দিচ্ছেন তাঁর দয়া বা রহমতকে উপলক্ষ্য করে আনন্দ করার। নিশ্চিতভাবে জানুন- এই রহমত বলতে হজুর পুরনুর (দঃ)-কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কুরআনের অত্র ভাষ্য মতেই তো- আল্লাহর যে রহমত (বা রহমতের উপলক্ষ্য) উম্মতের জন্য উপদেশ, অন্তরের ব্যাধির প্রতিকার এবং হৃদয় পথনির্দেশ- তাতে আমাদের আমাদের নবী কারীম (দঃ)-কে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে মেনে নিতে কে সন্দেহ পোষণ করবে! ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতি, হাফেয আসকালানী প্রমুখ বরণ্য তাফসীরবিদগণও এ ব্যাখ্যা সমর্থন করে বলেছেন- রহমত দ্বারা এখানে নবীজীকেই বুঝানো হয়েছে। এভাবে তাফসীর করার খুব মজবুত একটা ভিত্তি আছে- সূরা আযিয়ার ১০৭ নম্বর আয়াতে কারীমাটি- যেখানে হজুর পুরনুর (দঃ)-কে সমগ্র সৃষ্টির জন্যে রহমত হিসেবে আল্লাহ ঘোষণাই করে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহর রহমত হিসেবে তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা সন্দেহহীনভাবে স্বীকৃত, একে অমান্য করা নবীর সাথে শত্রুতা কিংবা হিংসার লক্ষণ বলে ধরে নিতে পারি।

কারো কারো আবার ভাবী আপত্তি এ কারণে যে- নবীর সীমিত বা পথে সারাজীবন চলতে হবে, তার জন্যে আবার বিশেষ দিন বা মাসে মিলাদুন্নবী (নবীর জন্যে আনন্দ উৎসব) করার অর্থ বুঝে আসে না!! উত্তরে সোজাপটা যে কথাটি বলবার আছে- নবীর আদর্শ জীবনভর অবিরল থাকা চাই, কিন্তু তা বলে বিশেষ কোন দিবস-মাসে উৎসব উদযাপন করাকে কোথাও বন্ধ করে দিতে বলা হয়নি। নির্দিষ্ট দিনে তাঁর জন্মদিন উদযাপন নবীজী নিজেই করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু কাতাদাহ আল আনসারী (রঃ)-এর বর্ণনা মতে প্রসিদ্ধ হাদীসটি তুলে ধরা যায়- রাসূলুল্লাহ (দঃ)-কে তাঁর সোমবারে রোজা রাখার হেতু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে- নবীজি বললেন- এই সোমবারেই (পৃথিবীপৃষ্ঠে) আমার জন্ম এবং নবুওয়াতপ্রাপ্তি হয়েছিল। মুসলিম শরীফ, কিতাবুস সাওয়া; বই নম্বর ৬, হাদীস নম্বর ২৮০৭।

নবীজী তাঁর জন্মের বিশেষ বারকে রোজা রাখার মধ্য দিয়ে পালন করেছেন, এ যেমন উদযাপনের একটি পন্থা, তেমনই রবিউল আউয়াল মাসও তাঁর আগমন এবং মহাপ্রয়াণের বিশেষ সাক্ষী- এই নেমামতের উপলক্ষ্যকে

রোজার মাধ্যমে পালন না করে আনন্দ উৎসবের পন্থায় মিলাদুন্নবী হিসেবে পালন করার তাৎপর্য হল আল্লাহর নির্দেশনা- নবীর আগমন উম্মতের জন্যে আমাদের উপলক্ষ্য বলে কুরআনে নির্দেশিত হয়েছে বলে, আর নবীজী তো তাঁর চাক্ষুস জীবদ্দশা এবং তাঁর মহাপ্রয়াণ উভয়টিকেই উম্মতের জন্যে কল্যাণকর বলেছেন। [কাশফুল আস্তাব আন জাওয়ায়িদিল বাজ্জার ১ম খণ্ড ৩৯৭ পৃষ্ঠা, ৮৪৫ নম্বর হাদীস]।

ঈদে মিলাদুন্নবীতে উম্মতে মোহাম্মদীর পক্ষ থেকে যে জৌলুনের আয়োজন চোখে পড়ে তাতে প্রথমত বিদআতের কিছু কি থাকতে পারে- যখন আল্লাহ- আল্লাহর রাসূল পর্যাপ্ত সূত্র বাতলে দিয়েছেন এ উপলক্ষ্যকে সামনে নিয়ে আনন্দ ও উদযাপনের! তারপরও আমাদের প্রকাশের ক্ষেত্রে এমন কিছু নতুনত্ব যদি এসে যায়, তখন হলই বা তা বিদআত- কুরআন হাদীসের বিরোধী কিছু না হয়ে যদি তা আনন্দকে বাড়াবার একটা মাধ্যম-মাত্র হয়- সেই প্রকাশভঙ্গিও আল্লাহর নির্দেশনা বাস্তবায়নের একটা কৌশল হিসেবেই গণ্য হবে।

এছাড়া ধর্মীয় উপলক্ষ্যকে সামনে নিয়ে এমনকি তরিখ নির্দিষ্ট করে অনুষ্ঠান করার উদাহরণ তো কম নয়- তাফসীর মাহফিল, জামা'তে মিছিল, আলোচনা সভা, খাদ্য পরিবেশনা এসব কোনটাই তো তরিখ ঘোষণা না করে মনের খুশিমত পালন করা যায় না। বিশ্ব ইজতেমা নামের যে ধর্মীয় আয়োজন চোখে পড়ে তার কথা কোরআন হাদীসের কোথাও উল্লেখ নেই, অথচ তা প্রতিবছরই উদযাপন হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে ঈদে মিলাদুন্নবীর মত আরো জোরালো বিষয়ের বিতর্ক করা অবান্তর।

অভিযোগ রটনা (৩)

পীর ধরা, পীরের কাছে বায়াত হওয়া, পীরকে সন্তুষ্ট করতে পারলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন মনে করা এসব কাজ সম্পূর্ণ বিদআত!!

খণ্ডন

বায়াত মানে কারো কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে তাঁর আনুগত্যে সোপর্দ হয়ে যাওয়া। কুরআনে পাকে সূরা ফাতাহ ১০ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা নবীর কাছে উম্মতে মোহাম্মদীর এই বায়াত গ্রহণের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কথা বলে দিয়েছেন- - (হে নবী)- আপনার নিকট যারা বায়াতের শপথ গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহরই বায়াতের শপথ নেয়। আল্লাহ ওদের

শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা -২৬

ক্ষতি হয়ে যায়, সমূহ চেষ্টা করেও বুদ্ধিতে কুলোলা না আমাদের। যা সংকাজ, অধিকিস্ত ঈমানের দিকে ধাবিত করে তাতে সেটা বিদআত হলেও তো বিদআতে সাইয়া (ভাল বিদআত), আর যেমনটাই হোক না কেন- অজ্ঞত নিষিদ্ধ হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না! তারপরেও হালকায়ে জিকির যে কোন ধর্ম-বহির্ভূত আমল নয়- এমনকি বিদআতও নয়- তারও প্রমাণ আমরা দেব।

রাসুলে পাক (দঃ) হালকাভুজ জিকির অর্থাৎ বৃত্তাকার সমবেত জিকিরকে জাল্লাতের বাগান বলে উপমা দিয়েছেন- [তিরমিজী শরীফ, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস ৩৫৭৭]। এছাড়া মুসলিম শরীফ বাবুজ জিকির ওয়াদ দুআ ৩৯ নম্বর হাদীসে এসেছে- রাসুলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ করেন- কোন সম্প্রদায় সমবেতভাবে জিকির করতে থাকলে ফেরেশতারা ওদের আবৃত করে, আল্লাহর রহমত তাদের উপর বর্ষিত হয়; আল্লাহও তাঁর নিকট ঐ জিকিরকারীদের স্মরণ করেন (অর্থাৎ ফেরেশতাদের সাথে নিয়েই আল্লাহ তাদের স্মরণ করেন)।

হজ্বের সময় হাজ্জীরা সমবেত হয়ে যে লাক্ষাইক আল্লাহুমা লাক্ষাইক ধ্বনি পাঠ করে সেটাও তো সম্মিলিত কণ্ঠের জিকির। এই বস্তুটিকে তবে কী বলা উচিত? বিদআত? হারাম? নাকি ইসলামের রোকনের বৈশিষ্ট্য?

অভিযোগ রটনা (৭)

যুত ব্যক্তি যত বড় ওলী বুজর্গ কিংবা কামেল লোকই হোন না কেন তাঁর কবরের উপর ছাউনি দিয়ে দরগাহ বা মাজার স্থাপন করা বিদআত।
এবং কবরে বাতি জ্বালানো বিদআত।

খণ্ডন

ছাউনি দেয়া দরগাহ বা রওজাকে নিজেদের খুশিমত নাজায়েয বলে প্রপাগাণ্ডা ছড়াতো- উঠে পড়ে যারা লেগেছে- স্বয়ং রাসূলে আকরম (দঃ) ও তাঁর নিকটতম দুই সহচর- হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রঃ) এবং হযরত ওমর ইবনে খাতাব (রঃ) এর কবর মোবারকের উপরও যে ছাউনি রয়েছে- সে কথা কি ওরা ভুলেই গেছে বেমানুম? তাও সেই রওজা বা মাজার রয়েছে এমন রাষ্ট্র- যেখানে সহজ সরল দ্বীনে ইসলামকে অপেক্ষাকৃত কঠোর অবস্থায় দেখা যায়।

রাসূলে করীমকে দাফন করা হয়েছিল হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রঃ) এর

শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা -২৭

ঘরে- নিঃসন্দেহে যা ছাউনি বিশিষ্ট ছিল। পরবর্তীতে তাঁর দুই নিকটতম সাহাবীকেও তাঁরই পাশে সেই ছাউনির নিচে দাফন করা হয়। যত বড় কামেল লোকেরই হোক না কেন- মাজার শরীফ নির্মাণ করা নাহক হলে- সেই নাহক তবে দ্বীন ইসলামের সর্বসর্বা রাসূলের এবং তাঁর সাহাবীদের স্থলেও প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে কী উপায়ে! এরপরও যদি বলা হয় রাসূল নিজে তো আর মাজার করেননি- তবে অত্যন্ত সহজ হব সেই অবান্তর প্রশ্নের উত্তর।- ধর্ম সম্পর্কে টিকমতই জালেন নবীজীর সেই-সব সহচররাই তো ছাউনির অভ্যন্তরে তাঁকে দাফন করেছেন। এ কাজ যদি নিষেধ হত তবে তাঁরা এমন কাজ কখিনকালে করতেন না, অন্যরাও তা সমর্থন করতেন না। সাহাবীদের দ্বারা ঘটিত দৃষ্টান্তগুলোও কিছু- ইসলামী আইনে বৈধ বিষয় কী হতে পারে- তা নির্ধারণ করে। নবীজী তো বলেছেনই- সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ, এরপরের উত্তম যুগ আমাদের যুগ। পেরেছে ওদের যুগ, এরপরের উত্তম যুগ হল সেই তদেরকে যারা পেরেছে ওদের যুগ- [বুখারী শরীফ, কিতাবুশ শাহাদাত, ২৬৫১ নম্বর হাদীস]। সাহাবী এবং তাবয়ীদের যুগে যেহেতু এই সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সুতরাং- ছাউনিওয়ানা স্থানে আল্লাহর পুণ্যবান বান্দাদের দাফন করার বিষয়টি অর্থাৎ মাজার নির্মাণ- ইসলামের উত্তম যুগেরই একটি স্বীকৃত বিধান।

কেউ যদি যুক্তি উত্থাপন করে- এই বলে যে- রাসূলের কবর মোবারকের উপর ছাউনি বিষয়টি ওভাবে দেখলে চলবে না, এটা আসলে মসজিদ! প্রত্যন্তের বলার আছে- শুরুতে এটি মসজিদ ছিল না, আয়েশা (রঃ) এর কুটিরই ছিল, আর বর্তমানে- হলই বা মসজিদ- রওজা হিসেবে তা বিদ্যমান করছে সেই ছাউনির মধ্যেই তো!

তবে ইসলামের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম হিসেবে যা চিহ্নিত হয়ে আসছে- সেখানে সংকর্মশীল বুজর্গ ছাড়া অন্য কারো কবরের উপর ছাউনি দেয়া বা মাজার নির্মাণকে স্বীকার করা হয়েছে বলে জানা নেই। ফলে মাজার প্রতিষ্ঠা করা বা কবর উঁচু করা এসব কেবল আল্লাহর নেককার বান্দা বা আউলিয়ায়ে কেরামের ক্ষেত্রেই সমীচীন।

মাজার বাতি জ্বালানো : অতীতে এমন একটি সময় ছিল- বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতপসারতার কারণে যখন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ছিল না- আলো যেত না সব স্থানে। সে কারণে অন্ধকারে বাতি জ্বালিয়ে রাখা ছিল একটি উপকারী আমল। আর তাই- মানুষ বাতি মানত করত। ধারাবাহিকভাবে এ থেবে

শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা -২৮

প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মাজারে বাতি জ্বালানোর ও বাতি মানত করার সংস্কৃতি। মোটকথা- অপর্যাপ্ত বাঁচিয়ে কাজে লাগানো হলে এই বাতি জ্বালানোর মধ্যে অন্তত গুনাহের কিছু চোখে পড়ে না।

অভিযোগ রটনা (৮)

কোন পীর-বুজুর্গকে ‘ওলীকুল সম্মাট’, ‘সুলতানুল আরেফীন’, ‘রাহনুমায়-শরীয়ত-ওয়াত-তুরীকত’, ‘গাউসুল আযম’ ইত্যাদি উপাধি দেয়া বিদআত !! বা কোন পীর বুজুর্গের নামের আগে ‘শাহ’ উপাধি দেয়াও বিদআত, এমনকি তা শিরকও বটে !!

ধ্বংস

একটা উদাহরণেই বুদ্ধিমানের পক্ষে উপরের অভিযোগের প্রত্যুত্তর পেয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

আমরা জানি যে- আল্লাহ পাক মহা-বিচারক এই সৃষ্টিজগতের। তা সত্ত্বেও প্রতিটি ইসলামী অথবা অ-ইসলামী রাষ্ট্রেও যেসব শাসন ব্যবস্থা চালু আছে- সেখানে আছে নির্দিষ্ট কতগুলো বিচার ব্যবস্থা- ওই বিচার ব্যবস্থায় থাকে প্রধান বিচারপতি। খোদাকেও মানুষ মহা-বিচারক ডাকে, আবার নিজেদের রাষ্ট্রেও একজন লোককে প্রধান বিচারক ডেকে বসছে। কিন্তু সকলেই তো জানে- আল্লাহ প্রধান বিচারক হওয়া আর রাষ্ট্রের কোন মানুষ প্রধান বিচারপতি হওয়া একি অর্থে বিচারক হওয়া নয়। আল্লাহর ক্ষেত্রে বিষয়টি অসীম এবং সমগ্র বিশ্বের উপর চূড়ান্ত সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা বলে বিবেচিত হবে- কিন্তু রাষ্ট্রের বিচারপতির ক্ষেত্রে সবাই জানে- তা সীমিত পর্যায়ের কোন ক্ষমতাবানকে পরিচিত করবার একটা উপাধি মাত্র। এই উপাধিতে রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতিকে সমোধানের সময় কেউ কখনো শিরকের বা মন্দ বিদআতের অভিযোগ তোলে না- কেননা তুললে তা নিতান্তই পাত্তা পাবে না, কৌতুকের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

এবার মিলিয়ে দেখলেই পারি।- যে কোন সম্মানিত অথবা নেককার হিসেবে পরীক্ষিত কাউকে ‘শাহ’ (বাদশা) উপাধিতে আব্বান করা হলে তাতে আল্লাহর সার্বভৌম বাদশাহিyyতের সাথে কোন তুলনা এসে যায় কি? কোন পীর বুজুর্গকে শাহ ডাকার অর্থ হল আল্লাহর ক্ষমতার অধীনে থেকেই সেই বুজুর্গ তাঁর অনুসারীদের সঠিক পথে থাকার ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ করছেন- যেটা আল্লাহরই প্রদত্ত এক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। এই ক্ষমতার প্রতি সম্মান দেখিয়ে

শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা -২৯

তাই আল্লাহর শ্রিয় বান্দাদের ‘শাহ’ বা ‘সুলতান’ নাম ডাকা হলে সেটা অতি অবশ্যই আল্লাহর সাথে তুলনা করার কোন বিষয় নয়। রাষ্ট্রের ‘প্রধান-বিচারপতি’র বিষয়টি যেমন একটা উপাধি মাত্র ছিল- সেটাকে যেমন শিরক বা হারাম ইত্যাদি বলার চিন্তা আসে না কারো মাথায়- একইভাবে পীর বুজুর্গকে ‘শাহ’ নামে আখ্যায়িত করা- তাঁকে সম্মান করার একটা উপাধি হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে- এখানেও শিরক বা হারামের প্রশ্ন আসছে না। এক কথায়- ‘শাহ’ বা ‘বিচারপতি’ বিশেষণগুলো শুধু একমাত্র আল্লাহকে ডাকার জন্য নির্দিষ্ট এমন নয়। ভিন্ন অর্থে এগুলো মানুষের ক্ষেত্রেও খুব স্বাভাবিক ভাবে প্রচলিত হয়ে থাকে।

‘সুলতানুল আরেফীন’, ‘রাহনুমায়-শরীয়ত-ওয়াত-তুরীকত’ বা ‘গাউসুল আযম’ প্রভৃতি যতরকম উপাধিই পীর-বুজুর্গ অথবা আউলিয়ায়ে কেরামের নামে ব্যবহৃত হোক না কেন- সেসবের সঠিক জায়গায় প্রয়োগ হলে তাঁর কোনটা ঘরাই আল্লাহর ওলী বা সংকর্মশীল বান্দাদের উপাধি দেয়া অন্যায় হবে না, বরঞ্চ তাঁদের উপযুক্ত সম্মান করা হবে।

অভিযোগ রটনা (৯)

‘নারায়ে তাকবীর’ তথা আল্লাহ আকবর ধ্বনির সাথে ‘নারায়ে রিসালাত’ অথবা ‘নারায়ে গাউসিয়া’ বলানো বিদআত !!

ধ্বংস

কালেমায়ে-ইতযাবা- কালেমায়ে-শাহাদাতে বিশ্বাস স্থাপন করা ব্যতিরেকে মুসলমান বা ঈমানদার কেউ হতে পারে না। সেই কালেমাতেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাথেই রয়েছে মুহাম্মাদুল রাসূলুল্লাহ। নামাজের আজান-ইকামত দিতে গেলেও তাকবীরের পরে আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ পাঠ করা অনিবার্য। এ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে- আল্লাহ আকবর ধ্বনির সাথে রিসালাতের ঘোষণা উচ্চারণ করা- ইসলামের একটি প্রথম শ্রেণীর আমল বা মৌলিক আমল। ফলে- নারায়ে তাকবীর- নারায়ে রিসালাত- এক সাথে বললে সেই আমলকে পুনরাবৃত্তি করা ব্যতীত কোন কুর্কম তো সংঘটিত হচ্ছে না।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ওয়াজ-মাহফিল, বা মিছিলে নারায়ে তাকবীর- নারায়ে রিসালাত বলতে থাকলে- তা দাঁড়াচ্ছে- ইসলাম ধর্মের কালেমাকেই বারবার উচ্চারণ করার বিষয় হয়ে। সেক্ষেত্রে তাকবীর ও রিসালাতের উচ্চারণ

শিরুক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা - ৩০

উচ্চস্বরে হল- বৃদ্ধি পাচ্ছে মুমীনদের অন্তরে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি মুহাব্বত- যেটাকে তুলনা করা যায় মুসলমানদের সমবেত কণ্ঠের জিকিরের সাথেও- যা দ্বারা কিছুতেই তাদের ঈমান আমলের পক্ষে লাভ বৈ ক্ষতি হবার ঝুঁকি আসে না।

নারায়ে তাকবীর- নারায়ে যিসালাতেব' সাথে যদি 'নারায়ে গাউসিয়া' যোগ হয় তখন অধিষ্ঠা যা দাঁড়ায় তা হল- একজন গাউসিয়তের পাদে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ অধ্যাত্ম উচ্চস্তর ওলী-আল্লাহর নামও আমরা আল্লাহ- আল্লাহর রাসূলের নামের পাশে জিকির করছি। এই জিকিরও আমাদের ঈমানের জন্য- ধর্মীয় প্রেরণা অর্থে বরকতময় হওয়া ছাড়া কোন অশুভ পরিণতি বয়ে আনছে না।

অভিযোগ রটনা (১০)

শাবানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে শব এ বরাত আখ্যায়িত করা ও শব এ বরাতের নিয়তে নামায পড়া ইত্যাদি বিদআত !!

শব এ মিরাজকে কেন্দ্র করে মেরাজের নামায পড়া ও মেরাজের রোজা রাখা বিদআত !!

শবে কদরকে কেন্দ্র করেও নির্দিষ্ট রাকাত নামাজ পড়া বিদআত !!

খণ্ডন

শাবানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত- শবে বরাত পালন করার অত্যন্ত স্পষ্ট ভিত্তি রয়েছে। ইমরান বিন হুসাইন (রঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁকে কি অন্য একজনকে একবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি মধ্য শাবানের রোজা পালন করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, না। অতঃপর তিনি তাঁকে রমজান মাস শেষ হলে দুটি রোজা পালন করতে বললেন। মুসলিম শরীফ, বই ৬, হাদীস ২৬০৭।

এক রাতে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রঃ) রাসূলে আকরমকে দেখতে না পেয়ে অবশেষে তাঁকে জালাতুল বাকীতে খুঁজে পান, এবং দেখেন যে- রাসূলে পাক আকাশের দিকে মস্তক উত্তোলন করে রয়েছে, এবং বলছেন- যখন অর্ধ শাবানের রাত আসে আল্লাহ পাক তখন পৃথিবীর নিকটতম আকাশে নেমে আসেন- এবং বলি কলবের ভেতর পশমের ঢেয়েও অধিক সংখ্যক লোককে ক্ষমা করে দেন। [হিবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৮৯]

এছাড়া মুয়াজ্জ ইব্নে নোজাবল (রঃ)-এর বর্ণনায়- রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ

শিরুক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা - ৩১

করেন- আল্লাহ তাঁ'লা অর্ধ শাবানে তাঁর সৃষ্টিকৃলের দিকে তাকান এবং মূশরিক ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন। [সাহীহ ইবনে হিবসান]

এ হাদীসে খুবই স্পষ্ট করে জানানো হচ্ছে- এমন এক পুণ্য রজনী এই শব এ বরাত- যখন বান্দাদের প্রার্থনা শোনার জন্যে- আল্লাহ তাঁর অকুরন্ত রহমতের আলি সাজিয়ে বসে থাকেন। খোদার বান্দারাও এ সুযোগ হারাতে চায় না- আল্লাহর কাছে তাঁরা প্রার্থনা করে, ক্ষমা চায়, নামাজ পড়ে, রোজা রাখে- নবীর ঘোষিত আল্লাহর রহমতের রাত শাবে বরাত পুণ্য আমল দ্বারা তারা আল্লাহর সম্বন্ধি অর্জন করতে চায়, কোন খারাপ কাজ করে না- এতেও যদি ধর্ম নাজন হয় তবে ধর্ম কাকে বলে ?

শবে মেরাজ হল- নবীজীর মেরাজ-যটনার স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যময় এক রজনী, আর লাইলাতুল কদর তো কুরআনেরই ঘোষিত- সমূহ বরকতের রাত। এ রাতগুলোকে সামনে নিয়ে মুসলমানরা সচরাচর নির্দিষ্ট ১২ রাকাত নফল নামাজ পড়ে। হোক না সেই নামাজ কতিপয় নির্দিষ্ট সংখ্যার রাকাতের অথবা যত ইচ্ছা বেশমার রাকাত হোক- আদতে তা নফল নামাজই তো- অভিযুক্ত (!) এই ১২ রাকাতে আল্লাহর বান্দারা একটু বেশি মাত্রায় প্রভুর ইবাদত করে মাত্র- কোন কুকাঙ্ক্ষা তো লিপ্ত থাকে না। আর এই নফল নামাজ যারা জামাতে পড়ে তারা মুসল্লীদের সম্মতি নিয়েই পড়ে- এখানেও কোন জোর জবরদস্তি নেই। মুসল্লীদের সম্মতি থাকলে জামাতে নফল নামাজ- বরং মুসলিম সংহতির জন্যে মঙ্গল।

নফল নামাজ পড়লেও নাজায়েয-হারামের ফতোয়া রটিয়ে যারা সরলঅন্তর মুসলমানদের বিশ্বাসকে বিভ্রান্তির দিকে নিতে চায়- ওদের তথ্য-সম্ভ্রাস থেকে শিরুক-বিদআত কত না নাম দিয়ে আরো হাজারো প্রকৃতির 'ভায়োল্যান্স' উৎপাদনের পরিকল্পনা চলছে এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ থাকুন।

শিবর, বিদ্যাত ও কিছু অপব্যাখ্যা -৩২

মন্তব্যের জন্য

tajkiatunnafs@gmail.com